অসুরকেও বাপের বাড়ি টেনে আনলে মা?

জহর সরকার

একটা জিনিস পুজোর সময় আমাদের সকলেরই চোখে পড়ে। মা দুর্গা মহিষাসুরের সঙ্গে ধুন্ধুমার লড়াই করছেন, অথচ তাঁর ছেলেমেয়েরা নিতান্ত উদাসীন ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে। সুদর্শন কার্তিক তাঁর অস্ত্র তোলেন না, গণেশের মুখে তো একটা হাসির আভাস, লক্ষ্মী নিজের ঝাঁপিটা আরও শক্ত করে চেপে ধরেন, সরস্বতীও বীণা হাতে দিব্যি দাঁড়িয়ে থাকেন। এই অদ্‌ভুত দৃশ্যের অর্থ বুঝতে ইতিহাসের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমে বাইরের ইতিহাস, তার পর ঘরের।

মধ্য প্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে সিংহবাহিনী দেবী হাজার হাজার বছর ধরে নানান নামে পরিচিত ছিলেন: মেসোপটেমিয়ায় ইস্‌থার, গ্রিসে আস্তারতেন, ট্রয়ে সিবিল। সিবিল তো এমন শক্তিমতী যে খ্রিস্টপূর্ব ২০৪ সালে রোমানরা তাঁকে তুরস্কের আনাতোলিয়া থেকে ধরে নিয়ে যায়, রোমের সম্রাটরা এই দেবীকে ‘দেবতাদের পরমা জননী’ হিসেবে আরাধনা করতেন। আজ যেখানে পবিত্র ভ্যাটিকান, চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে তাঁর মন্দির ছিল। লক্ষণীয়, তাঁর আরাধনা পরিচিত ছিল ‘পবিত্র বৃষের রক্তে ব্যাপ্‌টিজম’ নামে। তাঁকে ‘গুহার দেবী’ও বলা হত, যে নামটি শুনলে খেয়াল হবেই যে, দুর্গা কথাটা এসেছে ‘দুর্গম’ থেকে। মার্কিন ইতিহাসবিদ বারবারা ওয়াকার বলেছেন, ‘তিনি সন্তানের নিরাপত্তায় তত্‌পর জননীর সংগ্রামী সত্তার প্রতীক’। বাইবেলে দেখি, প্রফেট জেরেমিয়া সিংহবাহিনী ইস্‌থারকে বলেছেন এস্‌থার, স্বর্গের রাজ্ঞী। আবার, একটি প্রার্থনায় বলা হয়েছে, ‘তাঁর প্রভাবে সবুজ চারা মাথা তোলে’, শুনলে আমাদের দেবী দুর্গার ‘শাকম্ভরী’ রূপটির কথা মনে পড়বেই।

ইউরোপ এবং আফ্রিকাতেও স্মরণাতীত কাল থেকে মাতৃকাদেবীর আরাধনার প্রমাণ মিলেছে, আবার সিন্ধুসভ্যতাতেও তাঁর দেখা পাই। কিন্তু বৈদিক যুগ থেকে তাঁর মূর্তি বা অন্য নিদর্শন কমে আসে। শতপথ বা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ‘অম্বিকা’র উল্লেখ আছে, তবে দুর্গার নাম প্রথম পাই বৌধায়ন এবং সাংখ্যায়নের সূত্রে। আমাদের মহাকাব্যগুলিতে ইতস্তত দেবী, শক্তি ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু দশভুজা যুদ্ধরতা দেবীর বিশেষ কোনও খবর সেখানে নেই। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে আছে, অর্জুন দুর্গার পূজা করছেন। স্কন্দ-কার্তিকের মহিষাসুর নিধনের কথাও আছে। কয়েকটি পুরাণে দুর্গার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে তিনি যথার্থ স্বীকৃতি পেলেন, যখন মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যতে তাঁর মহিষাসুরবধের বন্দনা হল। অচিরেই ‘ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর’-এর পুরনো বৈদিক ত্রিমূর্তির স্থান নিলেন নতুন ত্রয়ী ‘বিষ্ণু শিব ও দেবী’, ব্রহ্মাকে পেনশন দিয়ে পুষ্করে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এমনকী মহান বৈদিক দেবতা ইন্দ্র পরিণত হলেন হিন্দু নামের একটি প্রত্যঙ্গে— যথা ধর্মেন্দ্র বা নরেন্দ্র। ইন্দ্রের নিজের মন্দিরগুলিও অন্তর্হিত হল।

দেবীমাহাত্ম্য-এর সময়ের অনেক আগে থেকেই ভাস্কর্যে দুর্গার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু দশভুজা বা অষ্টভুজা রূপে নয়। সম্ভবত দুর্গার প্রাচীনতম মূর্তিটি প্রথম শতাব্দীর: রাজস্থানের নাগরে পাওয়া টেরাকোটার মূর্তিটিতে মহিষ আছে, সিংহও, আছে ত্রিশূলও, তবে দেবী চতুর্ভুজা। আবার মথুরা মিউজিয়মে কুষাণ যুগের ছ’টি মূর্তি রাখা আছে, সেখানে মহিষ ও ত্রিশূল আছে, সিংহ নেই। গুপ্তযুগে এসে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিগুলি সুপরিণত, তাদের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু অদ্‌ভুত ব্যাপার হল, দুর্গা সম্পর্কে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বিবরণ পাই গুপ্তযুগের পরে। বাংলায় আর একটু পর থেকেই দেবীর নানান রূপ সম্পর্কে লেখা ও ভাস্কর্য আসতে শুরু করে, কিন্তু আজকের এই প্রতিমার রূপটিতে পৌঁছতে আরও কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে কৃত্তিবাসী রামায়ণে যুদ্ধরতা দেবী এবং রামচন্দ্রের অকালবোধন সম্পর্কে প্রচলিত নানান লোককাহিনিকে প্রথম একসূত্রে গাঁথা হল, তৈরি হল তার প্রথম নির্দিষ্ট বিবরণ, যাকে আগমার্কা বাঙালি কাহিনি বলতে পারি।

আশ্বিন-কার্তিকে দুর্গাপূজার ব্যাপারটা একেবারেই এই অঞ্চলের কৃষির সঙ্গে জড়িত। এখানে আমন ধান আসার অনেক আগে থেকে আউশ ধানের প্রচলন ছিল, সেই ধান পাকার সময়েই এই পুজো। মহিষের

ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার মনে হয়, এই প্রাণীটি নিচু জমিতে বাস করত, এই অঞ্চলে চাষের প্রসারের জন্য কৃষিজীবী মানুষ ক্রমশই মোষ তাড়িয়ে মেরে জমি দখল করে। (আমেরিকায় বহিরাগত শ্বেতাঙ্গরা যেমন বসতি বিস্তারের জন্য বিস্তীর্ণ ‘প্রেইরি’ বা তৃণভূমিতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ বাইসন মেরে সাফ করে দিয়েছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে নির্মূল করেছিল বাইসন-নির্ভর আদি বাসিন্দাদেরও।) মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার আরাধনা হয়তো এই মহিষ নির্মূল অভিযানকে একটা ধর্মীয় বৈধতা দেওয়ার কৌশল ছিল, বিশেষ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বা কংসনারায়ণের মতো জমিদারদের পক্ষে, যাঁদের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষির প্রসার।

রমাপ্রসাদ চন্দ এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচী বলছেন, সিংহবাহিনী দুর্গাকে গুপ্তযুগের পরে বাংলায় বাইরে থেকে আমদানি করা হয়, কিন্তু অন্যদের মতে এই অঞ্চলেই তাঁর উত্পত্তি। এক অর্থে দুটো মতই ঠিক, কারণ এই দুর্গার স্থানীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আবার বহিরাগত উপকরণও আছে। কিছু কিছু দুর্গামূর্তিতে দেখা যায়, সিংহের বদলে দুর্গার বাহন হল গোধিকা বা গোসাপের মতো একটি প্রাণী, কালকেতুর কাহিনিতে যার কথা আছে। লক্ষণীয়, গোসাপ অনেক বেশি প্রাকৃত, সিংহ সে তুলনায় সংস্কৃত প্রাণী। উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার পটুয়া ও চিত্রকররা সিংহটাকে ঠিক বাগে আনতে পারতেন না, কারণ তাঁরা তো জীবনে এই প্রাণীটিকে দেখেননি। উত্তর ভারতে আবার দেবী এখনও রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পিঠে, ‘শেরাবালি’। মজার ব্যাপার বটে।

ইন্দোনেশিয়ায় বোরোবুদুর, সুরাবায়া, বান্দুং-এর মতো কিছু জায়গায় ছয় বা আট হাত বিশিষ্ট দুর্গার দেখা মেলে। জাভার একটি লিপিতে দেখি, এক রাজা যুদ্ধের আগে এই দেবীর পূজা করেছিলেন। জাভায় পনেরো ও ষোলো শতকে দুর্গাকে রক্ষয়িত্রী হিসেবে আরাধনার প্রবল প্রচলন হয়। ইসলামের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমশ সমাধিক্ষেত্রে সীমিত হলেন, এবং সরে গেলেন হিন্দুপ্রধান বালিতে। এর পাশাপাশি, হিন্দু ধর্মের প্রভাব পড়েছিল, এমন আরও কয়েকটি দেশে দুর্গার পরিচিতি আছে।

দুর্গার ছেলেমেয়েদের কথায় ফিরি। স্পষ্টতই, রণরঙ্গিণীকে সংসারে বেঁধে ফেলে বশ মানাতে এবং মাতৃসুলভ দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে পিতৃতন্ত্র ক্রমশ ছেলেমেয়েদের যোগ করেছে। তত্কালীন কুমিল্লার দক্ষিণ মুহম্মদপুরে পাওয়া একটি দ্বাদশ শতকের মূর্তিতে দুর্গার সঙ্গে গণেশ ও কার্তিক আছেন, মেয়েরা নেই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরসীকুমার সরস্বতী এবং এনামুল হকের মতো ইতিহাসবিদরা অনেক চেষ্টা করেও চার ছেলেমেয়ে সংবলিত দুর্গার একটিও প্রাচীন ভাস্কর্য খুঁজে পাননি, যদিও ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাজশাহীর একটি মূর্তির কথা বলেছেন। কিন্তু বাংলায় জমিদারি প্রথা প্রবর্তনের পরে কী ভাবে এই প্রতিমা এল, সে সম্পর্কে কোনও লেখায় কোথাও উল্লেখ নেই। ধরে নেওয়া যায়, মেনকা এবং গিরিরাজের বাত্সল্য শেষ অবধি দুর্গাকে তাঁর বাপের বাড়িতে টেনে আনে। এবং আসতেই যদি হয়, তিনি কী করে চার সন্তানকে ফেলে আসেন? আর, বেচারি রক্তস্নাত মহিষাসুরকে সঙ্গে না আনলেও কি চলে? মেনকা যখন দেখলেন, তাঁর মিষ্টি মেয়েটা একেবারে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সোজা চলে এসেছে, দেখে চেনাই যাচ্ছে না, তখন তো তিনি একেবারে হতবাক। দাশরথি রায় এবং রসিকচন্দ্র রায়ের মতো কবিরা সেই দৃশ্যের চমত্কার বর্ণনা দিয়েছেন। জয় মা দুর্গা!

প্রসার ভারতী-র কর্ণধার। মতামত ব্যক্তিগত